বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস

অপার্থিব

প্রায়ই দেখা যায় ধর্মবাদীরা বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে দাবি করেন–ধর্মের সূত্র ও শ্লোকগুলি পাঠ করলে তার ভেতরেই বিজ্ঞানকে পাওয়া যায়। এখানে ধর্মবাদী বলতে ধর্মে বিশ্বাসী বোঝানো হচ্ছে না, যারা ধর্মকে পরম সত্য বলে দাবি করেন এবং এই দাবির সমর্থনে নিজস্ব যুক্তি উদ্ভাবন করেন, তাদেরকেই বোঝানো হচ্ছে। তাদের দাবি অনুযায়ী বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও মৌলিকতা ধর্মেরই প্রাপ্য। এই দাবি অবশ্যই ভ্রান্ত। কেউ যদি কোনো কিছুর মধ্যে বিজ্ঞান দেখতে বদ্ধপরিকর হন, তবে তিনি তাই দেখবেন। কোনো এক ব্যক্তি 'ক' একশ বছর আগে কথার ছলে কোনো প্রসঙ্গে বলেও থাকতে পারেন যে,—এ জগতের সবকিছুই আপেক্ষিক। তাই বলে কি আমরা দাবি করতে পারি 'ক' আইনস্টাইনের আগেই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব জানতেন? এর জন্য কী তাঁকেই ('ক'-কে) মৌলিকতার কৃতিত্ব দেয়া উচিত? মানুষের বা ধর্মপুস্তকের কোনো অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে বা দ্ব্যর্থক বক্তব্য বা শ্লোককে যে যার ইচ্ছা মত সুবিধাজনক ব্যাখ্যা বা অর্থারোপ করে বিজ্ঞানের কোনো এক সূত্রের সঙ্গে জোর করে মেলাতেই পারেন। বিশেষ করে সূত্রটার সত্যিকার জটিল এবং নিখুঁত বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় ব্যক্ত না করে যদি তাকে অতিসরলীকৃতভাবে বলা হয়, তাহলে মিলের একটা আভাস বের করা কঠিন কাজ নয়। এটা বলা ভুল হবে না যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই, ধর্মীয় পুস্তকের কোনো বাণী বা সূত্রকে ভিত্তি করে বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঘটেনি। তাই ধর্মকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেয়া বা ধর্মের উপর মৌলিকতা আরোপ করা একটা বড় ভুলই হবে। জগত ও প্রকৃতির অনেক প্রশ্নেরই উত্তর বিজ্ঞান খুঁজে পায়নি এখনও। কিন্তু তার কোনোটার উত্তর আবার ধর্মের সূত্রও দিতে পারেনি। বিজ্ঞান যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় তখন সহসা ওই উত্তরটা আবার ধর্মবাদীরা ধর্মপুস্তকের কোনো অস্পষ্ট শ্লোক বা আয়াতে অনায়াসে খুঁজে বের করতে পারবেন সন্দেহ নেই। দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা প্রাপ্ত) অব্যবহিত পরেই ধর্মবাদিরা বিজ্ঞানের সেই সূত্রকে ধর্মপুস্তকের ভেতরে আবার আবিষ্কার করেন! এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি কখনো। ধর্মবাদীরাই বিজ্ঞানকে অনুসরণ করেন, উল্টোটা নয়। এটা কি শুধুই কাকতালীয় ব্যাপার? মনে হয় না। ধর্মে বিজ্ঞান খোঁজা বা বিজ্ঞানে ধর্ম খোঁজা একটা মহাভুল। এটা যে ভুল তা শুধু ধর্মে অবিশ্বাসী বা সংশয়বাদীরাই বলেন না, ধর্মে বিশ্বাসী প্রখ্যাত প্রয়াত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আব্দুস সালামও এটা জোর দিয়ে বলেছিলেন। অনেকের বিজ্ঞানের 'মহাবিস্ফোরণ' বা বিগ-ব্যাং-এর তত্ত্বকে ধর্মের কোনো আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টায় অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলতেন যে 'মহাবিস্ফোরণ' হল জগত সৃষ্টির একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। সময়ের সঙ্গে জগত সৃষ্টির ব্যাখ্যায় অন্য কোনো উন্নততর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও আমরা পেতে পারি, কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাত্রই ক্রমাগত পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়। তিনি প্রশ্ন করতেন তখন সেই ধর্মবাদীরা কি ধর্মীয় শ্লোক বা আয়াতটির ব্যাখ্যাও সংশোধিত করবেন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য? বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার বিপদ এভাবেই তুলে ধরেছিলেন অধ্যাপক সালাম। দুঃখের বিষয় অধ্যাপক সালামের চেয়ে অনেক নিচু সারির কিছু বিজ্ঞানী এখনও বিজ্ঞানকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, নানা প্রবন্ধ পুস্তক ও বক্তৃতার মাধ্যমে, যার অনেকটাই কুযুক্তিতে ভরা।

কুযুক্তি বা সুবিধাবাদী যুক্তির মাধ্যমে শুধু যে অস্পষ্ট ধর্মীয় শ্লোক বা আয়াতকেই বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলানো যায় তাই নয়, অনেক প্রখ্যাত কবির কবিতায়, পুরাতন প্রবাদবাক্যে, একইভাবে চেষ্টা করলে বিজ্ঞানের সন্ধান মিলবে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার চেষ্টায় ধর্মবাদীরা দুটো পন্থা অবলম্বন করেন। একদল ধর্মবাদীরা এটা মেনে নিয়েছেন যে বিজ্ঞানের সাফল্য, মর্যাদা, যথার্থতা অবিসংবাদিত। তাঁরা যুক্তি দেন যে বিজ্ঞান ধর্মের বাণীকেই সমর্থন করে। অর্থাৎ ধর্মের বাণী বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার অনেক ধর্মবাদী আছেন যারা বিজ্ঞানকে খাটো করে দেখে এই যুক্তি দেন যে বিজ্ঞানের সব কিছুই ধর্মের বাণী যা বলে তারই সমর্থন। অর্থাৎ বিজ্ঞান ধর্মের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (দুটোর সূক্ষ্ম তফাৎ লক্ষ্যনীয়)। দুটো যুক্তিরই ত্রুটি আছে। প্রথমোক্তের যুক্তি অনুযায়ী বিজ্ঞানকেই মুখ্য ধরে ধর্মকে বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থন/যাচাই করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্পষ্টই বিজ্ঞানের নিরিখে ধর্মকে যাচাই করার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এটা ধর্মবাদীদের জন্য স্ববিরোধিতারই সামিল। কারণ তাঁদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্মের স্থান সবার উপরে। দ্বিতীয়োক্তের ত্রুটি হল যে তাঁরা ধর্মকে মুখ্য ধরে বিজ্ঞানকে ধর্মের দ্বারা যাচাই করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিজ্ঞানকে ধর্মের দ্বারা যাচাই বা সত্য প্রমাণ করতে হলে বিজ্ঞানের ভাষায় ও বৈজ্ঞানিক শব্দাবলি ব্যবহার করেই করা সমীচিন, যা সূক্ষ্ম এবং দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু ধর্মের বাণী বা শ্লোকগুলির ভাষা খুবই সাধারণ, অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থক, যা কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণাবাহী শব্দ ব্যবহার করে না, তাই বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি পূরণ করতে পারে না। জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি কোনো জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সাধারণ পাঠকের জন্য সহজ ভাষায় ব্যক্ত করলে তার ভাষাতেও একটা ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক ধারণা, শব্দাবলি ও স্পষ্টতা দেখা যায়, যা ধর্মের বাণী বা শ্লোকগুলিতে অবর্তমান।

এখন বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার আর এক সমস্যাপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনায় আসি। এই যুক্ত করার প্রয়াস কম-বেশি সব ধর্মেই দেখা যায়। এমন অনেক বই বা প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দেয়া যায় যাতে বিজ্ঞানের দ্বারা বাইবেলের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে; যেমন—"Genesis and the Big Bang: The Discovery of Harmony Between Modern Science and the Bible, Gerald L. Schroeder". কেউ তাওরাতকে বিজ্ঞানের আলোকে সত্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, যেমন—" Thinking About Creation: Eternal Torah and Modern Physics, Andrew Goldfinger" আবার কেউবা বেদকে পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, যেমন 'Vedic Physics—Raja Ram Mohan Roy, Subhash Kak' এখানে উল্লেখ্য যে এই রাজা রামমোহন রায় (উল্লিখিত বইয়ের লেখকদ্বয়ের একজন) কিন্তু ইতিহাসের সেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন নন। যাহোক, এই সব প্রয়াসের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায়। সেই ধর্মীয় শ্লোকের অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে দ্ব্যর্থক ভাষায় সুবিধাজনক ব্যাখ্যা দিয়ে মিল খোঁজার চেষ্টা। এই চেষ্টায় কোনো ধর্মই এমন কোনো বিশেষত্ব দেখাতে পারে না, যার জন্য অন্য সব প্রয়াস থেকে তাকে আলাদা কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সর্বসম্মতক্রমে যুক্তিসঙ্গত বলে রায় দেয়া যায়। কারও কাছে 'ক' ধর্মের যুক্তি অধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে, আবার কারো কাছে 'ঘ' ধর্মের। বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার এই প্রয়াসের মূল কারণ যেহেতু একটি বিশেষ ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করা, সেহেতু নিরপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে হয় সব ধর্মই সত্য প্রমাণিত হতে হবে অথবা সবই ভুল প্রমাণিত হবে। যেহেতু সব ধর্মই একই সাথে সত্য হতে পারে না (কারণ যে কোনো দুই ধর্মের মধ্যেই এক

বা একাধিক পরস্পর বিরোধী বাণী আছে), সেহেতু বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার প্রয়াসকে সঠিক বিচার করলে সব ধর্মই ভুল এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। একটা উদাহরণ দেয়া যাক :— মালি দেশে ডোগান নামক এক সম্প্রদায় আছে, যাদের লোককথা অনুযায়ী আকাশে একটা তারা আছে, যে তারায় তাদের উদ্ধারকারী প্রভু বাস করেন। আধুনিক পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যার অনেক আগেই তাদের লোককথায় তারাটির আকাশে অবস্থান, তার আবর্তনকাল সবই উল্লেখ করা ছিল। পরে পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা বাস্তবিকই আকাশের ঐ স্থানে, সঠিক আবর্তনকালের একটা তারা আবিস্কৃত হয় যার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম Sirius–B বা Dog Star । ধর্মবাদিদের বিজ্ঞানের সত্যের দ্বারা ধর্মকে বিশ্বাসযোগ্য করাকে মেনে নিলে ডোগানদের ধর্মকে অবশ্যই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু বিচার বিশ্লেষণের আলোকে কেউ ভাবতে পারেন যে, আসলেই ডোগানদের ধর্ম সত্য, তাদের প্রভু সত্যিই ঐ তারায় বাস করেন যিনি ঐ তারার সঠিক তথ্যটি তাদেরকে প্রদান করেছেন? না-কি এটা মনে করা যে, যেহেতু আমরা জানি যে প্রাচীনকালেও সুমেরিও, মিশরীয়, গ্রিক, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা উন্নত ছিল, হয়ত এই তথ্য তাদের জানা ছিল। কোনো প্রকারে এই তথ্য কালের স্রোতে ভেসে গিয়ে কেবলমাত্র ডোগানদের কাছেই সংরক্ষিত হয়ে থাকে? বা অন্য কোনো সম্ভাবনা?

আসলে সমস্যা 'তৈরি' করার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার প্রয়াসের অন্তর্নিহিত আত্মনির্ভরতা (Subjectivity), কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভাষা অবশ্যই বস্তুনির্ভর (Objective); কাজেই ধর্মের দ্বারা বিজ্ঞানকে যথার্থায়ন বা বৈধকরণ (Validation) বা বিজ্ঞানের দ্বারা ধর্মকে যথার্থায়ন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এতক্ষণ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে যুক্ত করার প্রয়াস নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসি কিছু ধর্মবাদিদের বিজ্ঞানকে ধর্মের বিপরীতে এনে তাকে খাটো করে দেখানোর বা ধর্ম যে বিজ্ঞানের চেয়ে কোনো অংশে কম-সত্য নয়, তা প্রমাণ করার প্রয়াসে। তাদের একটা যুক্তি হল যে বিজ্ঞানের সত্যের ভিত্তিও তো 'বিশ্বাস'। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পাওয়া বিজ্ঞানের সত্যকে 'সত্য' বলে যদি গ্রহণ করা যায়, তবে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পাওয়া ধর্মীয় সত্যকে কেন 'সত্য' বলে গ্রহণ করা যাবে না? এই যুক্তির একটা সমস্যা হল যে শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোনো মতকে সত্য বলে দাবি করলেই যদি তাকে 'সত্য' বলে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সব ধর্মকেই 'সত্য' বলে মানতে হয়। আর শুধু ধর্ম কেন, পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় বা উপজাতির বিশ্বাস ও কুসংস্কারভিত্তিক মত ও তথ্যকেও সত্য বলে মানতে হয়। তারা এটা বোঝেন না যে বিজ্ঞানের সত্য আর ধর্ম যাকে সত্য বলে দাবি করে, তার ভিতর এক বিরাট পার্থক্য আছে। বিজ্ঞানের সত্য যুক্তি আর প্রমাণের (Logic & Evidence) দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে এবং সর্বজনীনভাবে যাচাইকৃত; এবং যাচাইকরণের প্রণালীও বস্তুনির্ভর। বিজ্ঞানের সত্যকে 'সত্য' বলে গ্রহণ করার কারণ সেটাই, বিশ্বাসের জন্য নয়। কোনো ধর্মের দাবিকৃত 'সত্য'ই বস্তুনির্ভর যুক্তি আর প্রমাণের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে এবং সর্বজনীনভাবে যাচাইকৃত হয়নি। কোনো এক বিশেষ ধর্মের সত্যের দাবিদার কেবল সেই ধর্মের অনুসারিরাই; এবং তাদের সত্যের যুক্তি আত্মনির্ভর। এই দাবি সত্য বলে গ্রহণ করার ন্যূনতম মাপকাঠিও পূরণ করে না। এটা সত্য যে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যেরই সূত্রপাত বিশ্বাস থেকেই। কিন্তু সে বিশ্বাস কোনো দৈবশক্তি বা মনুষ্য কর্তৃক প্রদত্ত কোনো বাণীর উপর ভিত্তি করে নয়, বরং বুদ্ধিমান অনুমান (যেমন অক্কামের ক্ষুর বা Occam's Razor নামক এক পরীক্ষিত দার্শনিক সূত্র), স্বজ্ঞা, সাধারণ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ এর উপর নির্ভর করেই; এবং সেই অনুমান

কোনো বিশেষ ধর্ম বা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস আর অন্য সকল বিশ্বাসের মধ্যে আছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে 'প্রকল্প' (Hypothesis) বলা হয়। কিন্তু প্রকল্প বিশ্বাসভিত্তিক অনুমান হলেও সেই অনুমানকে আরো পরিশীলিত করে যুক্তি, প্রমাণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে একটা তত্ত্বে না আসা পর্যন্ত তাকে সত্য বলে দাবি করেন না বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানের সত্যের দাবিতে জবাবদিহিত্ব নিহিত আছে। বিজ্ঞানের 'সত্যে'র দাবিকে 'মিথ্যাকরণ' (Falsification) বা সংশোধন/পরিশীলন করা সম্ভব, যা অন্য কোনো 'সত্যে'র দাবির বেলায় প্রযোজ্য নয়, কারণ সেগুলি শর্তহীন; পরমভাবে সত্য বলে দাবি করা হয়, আর যেহেতু তা বস্তুনির্ভর যুক্তি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়, সেহেতু তাদের দাবিতে 'মিথ্যাকরণে'র সম্ভাবনাকেও স্থান দেয়া হয় না।

উপরের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Scientific Method) আভাস উল্লেখ করা হয়েছে। 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' বলতে কি বোঝায় তার কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল পর্যবেক্ষণের এক সুসংহত ব্যাখ্যা বের করা এবং এর দ্বারা প্রকৃতির কোনো সূত্র-বিধির উদ্ঘাটন করা। নিচে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হল, ক্রমিক অনুযায়ী :—

১। প্রথমে আসে পর্যবেক্ষণ বা অবেক্ষণ (Observation)
২। পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রতিসাম্য, সরলতা (Symmetry/Simplicity) প্রভৃতির ধারণা ও বিবেচনাকে বিধৃত করে কিছু সম্ভাব্য প্রকল্প (Hypothesis) প্রস্তাব করা।
৩। যুক্তি ও অদ্যাপিলব্ধ প্রজ্ঞা ও প্রমাণকে (Logic & Evidence) কাজে লাগিয়ে প্রকল্পকে একটা তত্ত্বে (Theory) উন্নীত করা।
৪। তত্ত্বের ভিত্তিতে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করা (মানুষের ভাগ্য নয়, পর্যবেক্ষণের)।
৫। প্রকৃতি বা পরীক্ষাগারে লব্ধ পর্যবেক্ষণের দ্বারা ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা/ ভ্রান্ততা যাচাই করা।
৬। যদি ৫ নং ধাপে ভবিষ্য□বাণী ভ্রান্ত বলে প্রমাণ হয় তাহলে ২ নং ধাপে ফিরে গিয়ে বিকল্প কোনো প্রকল্প প্রস্তাব করে আবার ৩নং ধাপ থেকে শুরু করা এবং যতক্ষণ না ৫ নং ধাপে ভবিষ্য□বাণীর সত্যতা যাচাই না হয় এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা।
৭। ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা অনেকবার যাচাই হলে তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা বিধির (Scientific Law) পর্যায়ে উন্নীত করা।

এটা উল্লেখ্য যে বৈজ্ঞানিক সূত্রে উন্নীত হওয়ার পরেও যদি কখনো কোনো পর্যবেক্ষণ সূত্রের ভবিষ্যৎবাণীর বিরুদ্ধে যায় তাহলে সেই সূত্রকে পরিত্যাগ করে পুনরায় উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি নেয়া হয়। অনেক সময় নতুন কোন পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করার জন্য সূত্রটিকে পরিত্যাগ না করে পরিবর্ধন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যার ফলে পূর্বের ও নতুন পর্যবেক্ষণ উভয়কেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সূত্রটির পূর্বের রূপকে ভুল বলা ঠিক হবে না, বরং তা এক সীমিত পর্যবেক্ষণ সমষ্টির মধ্যে প্রযোজ্য বলে ধরে নেয়া হবে। যেমন—আপেক্ষিকতার বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্ব। 'আপেক্ষিকতার সাধারণতত্ত্ব' আবিষ্কারের জন্য আপেক্ষিকতার বিশেষতত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়নি, বরং তার কার্যক্ষেত্রের সীমা নির্ধারিত হয় মাত্র। এখন আসি বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু ভ্রান্তিমূলক উক্তি ও ধারণায় :

১। অনেক ধর্মবাদীরা কোন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যেই মতান্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এই যুক্তি দেন যে, বিজ্ঞানীদের মধ্যেই যেখানে এত ভিন্নমত, সেখানে বিজ্ঞানের সত্যের দাবির কী বিশ্বাসযোগ্যতা আছে? তারা ধর্মীয় সত্যের দাবির ব্যাপারে ধর্মানুসারে 'ঐক্যমত'-এর কথা উল্লেখ করে ধর্মের সত্যের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেন।

ধর্মবাদীদের উপরোক্ত যুক্তির দুটো ত্রুটি ধরা পড়ে। প্রথমত, ধর্মীয় সত্যের দাবির ব্যাপারে ধর্মানুসারে একমতের কারণ হল এই যে, ধর্মবিশ্বাসের মূল পূর্বশর্তই হল ধর্মের সত্যের দাবিকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা এবং তার প্রতি ক্রমাগত অন্ধ-আনুগত্য প্রদর্শন করে যাওয়া। বস্তুনির্ভর বিচার বিশ্লেষণের কোনো স্থান নেই ধর্মবিশ্বাসে। যারা এই পূর্বশর্ত স্বাভাবিকভাবেই নেন, শুধু তারাই তো ধর্মানুসারী। কাজেই ধর্মের ব্যাপারে ধর্মানুসারীদের 'ঐক্যমত' দিয়ে ধর্মের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা ভিত্তিহীন এবং ত্রুটিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, কোনো বিশেষ তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীমহলে মতান্তর থাকলে তাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সত্যের ভুল বা যথার্থতার অভাব প্রমাণিত হয় না। কারণ বৈজ্ঞানিক মতান্তর সেই তত্ত্বের ক্ষেত্রেই ঘটে যেখানে এখনো পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে বা প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি সঠিক, সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবার পরেই কেবল তা বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা পায়। তত্ত্ব থেকে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই এক অঙ্গ বা রেওয়াজ। বৈজ্ঞানিক মতান্তর বৈজ্ঞানিক সত্য আহরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক তত্ত্ব থাকলেই পর্যবেক্ষণের বাছাই-ক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক তত্ত্বটি, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্যটি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এটা বিজ্ঞানের শক্তি, দুর্বলতা নয়। তবে এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভুল হলেও তা যুক্তিহীন, বিশ্বাসভিত্তিক নয়, ভুলের কারণ সাধারণতঃ কোনো ভ্রান্ত অনুমান, প্রকল্প বা উপাত্ত বা আরো সঠিক অর্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ২ নং ধাপে মতান্তরের জন্য (যে কারণেই হোক); ভুলই হোক বা সত্যই হোক, কোনো তত্ত্বে যুক্তিহীনতা থাকলে বা তা শুধু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই প্রস্তাবিত হলে সেটি তত্ত্ব বলে গৃহীত বা গণ্যই হবে না।

২। ধর্মবাদীদের দ্বিতীয় এক ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তি হল–বিজ্ঞানের সীমা আছে, সব কিছুর উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর ধর্মেই খুঁজতে হবে। এই উক্তির ত্রুটি হল বিশ্বাসকে জ্ঞান বা জানার (ঈড়মহরঃরড়হ) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। 'বিশ্বাস' এক ব্যক্তিনির্ভর অনুভূতি, সেটাকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ তার মনের কোনো প্রশ্নের উত্তর বা সত্যকে জানা বলতেই পারেন। কিন্তু সেই অনুভূতিভিত্তিক ব্যক্তিগত সত্যের উপলব্ধিকে কেউ যদি সত্য বলে বাহিরে প্রচার ও যাহির করতে চেষ্টা করেন, তখন অন্যকে তা সত্য বলে মেনে নিতে হলে সত্য যাচাইয়ের সব মাপকাঠিকে প্রয়োগ করতে হবে; এবং সেটা যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো সত্য যাচাইয়ের মাপকাঠির ধোপে না ঠেকে তাহলে সেটাকে সবার জন্য সত্য বলে মেনে নেয়ার কোনো যুক্তিকতা থাকে না, উপরন্তু যেহেতু দাবিদার ঐ সত্যটিকে নিজের ব্যক্তিগত গণ্ডির বাইরে এনে তাকে 'সত্য' বলে সবার সামনে পেশ করেছেন, সেহেতু দাবিকে যুক্তি-প্রমাণের আওতায় আনা এবং তা মাপকাঠিতে না টিকলে সেই দাবিকে যুক্তিহীন বলে দাবি করাটা মোটেই অযৌক্তিক হবে না। এটা বলাই বাহুল্য যে আজ

পর্যন্ত ধর্ম এমন কোনো সত্য দিতে পারেনি, যা কিনা যুক্তি প্রমাণের মাপকাঠিতে টিকতে পারে এবং যা বিজ্ঞানের দ্বারা আগেই জানা যায় নি।

৩। আরেক ভ্রান্ত উক্তি হল:—"বিজ্ঞান দাম্ভিকতাপূর্ণ, বিজ্ঞানীরা সবজান্তার ভান করেন..." ইত্যাদি। আসলে সত্য কিন্তু উল্টোটাই। বৈজ্ঞানিকেরাই সর্বদা ভুলের সম্ভাবনার জন্য সদাজাগ্রত থাকেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেই বিনয় নিহিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংশোধন বা পরিবর্ধনের স্থান সর্বদাই রাখা হয়। বড় বড় অনেক বৈজ্ঞানিকই অনেক ভুল করেছেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে তা স্বীকারও করেছেন। যেমন, আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সাধারণ মহাকর্ষ সমীকরণে একটি পদ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যা পরবর্তীতে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে উল্লেখ করেছিলেন। নোবেল বিজয়ী রসায়নবিদ লিনাস পলিঙ্গও ডি.এন.এ অণুর গঠনে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন, যা নোবেল বিজয়ী ওয়াটসন এবং ক্রিক সঠিকভাবে দিয়েছিলেন প্রায় একই সময়ে। বিজ্ঞানীরা নিজেকে অভ্রান্ত মনে করেন না এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকেও বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীরা কখনোই পরম সত্যের মর্যাদা দেয় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বৈজ্ঞানিক সত্যের চেয়ে অন্য কোনো সত্যের দাবি সমান বা বেশি বিশ্বাসযোগ্য। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমেই ধাপে ধাপে প্রকৃত সত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সত্যকে জানার জন্য এরচেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য কোনো পথ বা সাধনী মানুষ প্রজাতির জানা নেই।

অপার্থিব : মুক্তমনার ফোরামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অপার্থিব এর সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা হিসেবে ও লেখক হিসেবে। পুরো নাম অপার্থিব জামান, তবে অপার্থিব নামেই লিখে থাকেন। বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, যুক্তিবাদ অধিবিদ্যা তাঁর প্রিয় বিষয়। পদার্থবিদ্যার এই স্নাতক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। ইমেইল : aparthib@yahoo.com